আকর্ষণেই ইংরেজ ও ইয়োরোপের অন্যান্য বণিকেরা কার্যত এদেশে এসেছিল। এত সম্পদবহুল উপমহাদেশের কর্তা হওয়ার জন্য স্বাভাবিকভাবেই ইয়োরোপীয় বণিকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা লেগে যায়।

১.৩ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন

১৬০০ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের ৩১ তারিখে এক রাজকীয় সনদের জোরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয় লন্ডন শহরের ব্যবসায়ীদের যৌথ কোম্পানি হিসাবে। উদ্দেশ্য, পূর্ব দিকের বাণিজ্যে ওলোন্দাজদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা। পূর্ব দিকের ক্ষেত্রে ইংল্যান্ডের সমস্ত ব্যবসার একচেটিয়া অধিকার কোম্পানিকে দেওয়া হয়েছিল। ব্যবসায়ে অর্থের জোগান দেওয়ার উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ড থেকে সোনা-রূপা আনার অধিকারও কোম্পানিকে দেওয়া হয়েছিল। এমন একটা সময়ে এই অধিকার দেওয়া হয়েছিল যখন মূল্যবান ধাতুই একমাত্র সম্পদ এইরকম ব্যবসাদারি মনোবৃত্তির প্রাধান্য ছিল। তবে সেসময়ে ভারতে উপনিবেশ স্থাপনের বা বিভিন্ন স্থান দখলের উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে খোলাখুলি কোন আইনগত আদেশ দেওয়া হয় নি। যা হোক, পর্তুগীজরা এদেশে আগে এসেছিল। তাদের সঙ্গে হিসেব নিকেশ মিটিয়ে ১৬১৩ খ্রিস্টাব্দে থেকে এদেশে কোম্পানি রীতিমত ব্যবসাপত্র শুরু করে দেয়। মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে কোম্পানি একটি ফরমান (আদেশ-নামা) পায়। সেই আদেশ অনুযায়ী কোম্পানি ভারতে ব্যবসাকেন্দ্র স্থাপনের অনুমোদন পায়। পশ্চিম উপকূলে সুরাটে প্রথম কারখানা স্থাপিত হয়। ১৬১৭ খ্রিস্টাব্দে জাহাঙ্গীর স্যার টমাস রো-কে ইংরেজদের প্রতিনিধি ও দূত হিসাবে তাঁর রাজদরবারে অভ্যর্থনা জানান। ছোট আকারে এইসময় থেকেই কোম্পানির ব্যবসার শুভসূচনা হয়। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও তাদের ব্যবসায়িক কাজকর্ম ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে। সতেরো শতক শেষ হওয়ার আগেই বোম্বাই, কলকাতা ও মাদ্রাজ ইংরেজদের প্রধান তিনটি কর্মকেন্দ্র হয়ে ওঠে। আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে থেকে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের শুরু হয়। এবং একশ বছরের মধ্যে প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষ কোম্পানির অধীনে চলে যায়।

পি. জে. মার্শালের (১৯৬৮) মতে ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে পীটের ভারত শাসন আইন পাশ না হওয়া পর্যন্ত ভারতে রাজনৈতিকভাবে স্থান দখলের উদ্দেশ্যে ব্রিটিশের তরফে কোন সচেতন বা দৃঢ় প্রয়াস বা নীতি ছিল না। কর্তৃত্বের প্রশ্নে ব্রিটেনে তখন দুটি ভাগ দেখা দিয়েছিল। একদিকে ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নির্দেশকদের সভা আর অন্য দিকে ছিল সরকারের সূক্ষ্ম নিয়ন্ত্রণ। ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে স্থান দখলের উৎসাহ কোন পক্ষের মধ্যে ছিল বলে মনে হয় না। যদিও অবশ্য ততদিনে ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত এলাকা বেশ বেড়ে দিয়েছিল। মার্শাল বলেছিলেন "ভারতে ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত এলাকা বৃদ্ধির পেছনে কোন পরিকল্পনা ছিল না,

ব্রিটেনের থেকে কোন নির্দেশও ছিল না।" [৮৩] ভারতে কর্মরত আধিকারিকেরাই উদ্যোগী হয়ে কর্মপন্থা স্থির করত। ভারতে স্থান দখলের ও উপনিবেশ স্থাপনের ব্যাপারে লন্ডন থেকে কোন নীতি নির্দেশ আসত না। মার্শাল অবশ্য পূর্বের একটি প্রবন্ধে স্বীকার করেছেন যে আঠারো শতকের গোড়ায় বাণিজ্যের যথেষ্ট বিস্তার হয়েছিল। সাম্রাজ্যের সঙ্গে ব্যবসারও ভাল যোগ ছিল। সেই সংযোগকে উপেক্ষা করা কঠিন। [৮৪] তবে মুঘল কর্তৃত্বের অবনতির ফলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অস্থিরতা দেখা দেয়। সেই সুযোগে কোম্পানির পক্ষে রাজ্যবিস্তার করাও সহজ হয়েছিল। কাজেই আঠারো শতকের ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ঘটনাবলী ভালো করে বোঝা দরকার। তাহলে কোম্পানির রাজ্যবিস্তারের ইতিহাস ধরা যাবে। ইংরেজ কোম্পানি আসলে "রাজনৈতিক ঘটনাবলীর গতিপ্রকৃতি বুঝে শুধু সুযোগের সদ্ব্যবহার করত এবং সেই অনুযায়ী পাল্টা জবাব দিত"। [৮৫] অন্যভাবে বলা চলে যে, আঠারো শতকের ভারতে প্রান্তীয় এলাকাগুলিতে নানারকম রাজনৈতিক ঘটনা ঘটছিল। মুঘল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রেও নানারকম শিথিলতা, দুর্বলতা ছিল। তবে কেন্দ্রের ঘটনা অপেক্ষা সাম্রাজ্যের প্রান্তীয় এলাকার ঘটনাবলীতে কোম্পানি অনেক বেশি উৎসাহী ছিল। আর সেসব অশান্তির সুযোগে কোম্পানি তার প্রভাবসীমা বাড়াতে উৎসাহী হয়। সি.এ.বেইলির মতে ১৭৮০'র দশকের পরেও কর্তৃত্বের প্রসারণের পিছনে ব্যবসায়িক স্বার্থ অপেক্ষা কোম্পানির সামরিক প্রয়োজন ও রাজস্ব আদায়ের স্বার্থই বেশি কাজ করত। কারণ "মুক্ত ব্যবসায়ীরা অনেকটা ছিলেন টাকার ওপর মাছির মতন"। [৮৬]

তবে প্রান্তীয় এলাকায় এসব লোকেদের "আধা-সাম্রাজ্যবাদের" গুরুত্ব অস্বীকার করা কঠিন। [৮৭] কোম্পানির এলাকা দখলের লড়াইয়ে এসব প্রান্তস্থানীয় চাপ চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করত ঠিকই। তবে ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনায় মহানগরও জড়িত ছিল। এখানে সেই সাক্ষ্যও আমরা হাজির করতে পারি। প্রথম থেকেই বলপ্রয়োগ করে ব্যবসা উন্নত করাই ছিল ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির স্বাভাবসিদ্ধ কাজ। এ ব্যাপারে যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ আছে। কোম্পানির ব্যবসা সব সময়েই সশস্ত্রভাবেই চলত। [৮৮] কোম্পানি ও ব্রিটিশ রাষ্ট্রের মধ্যে আপাত বিচ্ছেদ ছিল। কিন্তু তলে তলে এদুটির মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল, ইংল্যান্ডের কূটনৈতিক লক্ষ্য পূরণে সহায়তা দানের ক্ষেত্রে। যেহেতু সুযোগ-সুবিধা বা বলতে গেলে একেবারে অস্তিত্বের ব্যাপারে কোম্পানি নির্ভর করত রাজকীয় বিশেষ অধিকারের ওপর। [৮৯] ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্টুয়ার্ট রাজা প্রথম জেমস্ ও প্রথম চার্লসের আমলে এবং গৃহযুদ্ধের সময়ে কোম্পানির সঙ্কটের মধ্যে পড়ে ও তার সুযোগ-সুবিধার হ্রাস করা হয়। কিন্তু ইংল্যান্ডের সিংহাসনে যখন দ্বিতীয় চার্লস বসেন, তখন থেকে পরিস্থিতির উন্নতি হয়। রাজতন্ত্রের সম্পদ ও স্বাধীনতা রক্ষার

উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় চার্লস ও তার ভাই দ্বিতীয় জেমস্ উঠেপড়ে লাগেন। বিদেশে আগ্রাসী বাণিজ্যনীতি অনুসরণ করতে শুরু করে দেন। প্রকৃতপক্ষে এইভাবে বাণিজ্যনীতি অনুসরণ করতে গিয়ে ভারত মহাসাগরে নৌশক্তির প্রয়োগ শুরু হয়ে যায়। ভারতের উপকূল এলাকাগুলিতে সুরক্ষিত ঘাঁটি তৈরি করা হয়। একেবারেই নিয়ম করেই এসব করা হয়েছিল। প্রসঙ্গত ফিলিপ লসনের কথা মনে আসে। তিনি বলেছেন যে ভারতের স্থানীয় বাজারে নিজেদের বাণিজ্যিক তথা আর্থিক স্বার্থ সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে ইংরেজরা সশস্ত্র থাকাই সঠিক কাজ বলে মনে করেছিল।[৯০] ইংরেজরা তাদের সশস্ত্র নৌবাহিনী দিয়ে পূর্ব দিকের ব্যবসার ধাঁচাটিকে পুরোপুরি পাল্টিয়ে ফেলতে পারেনি। তবে ভারতের স্থানীয় বাজারে ইংরেজদের ব্যবসায় যাতে মন্দা না-আসে, অথবা ভারতীয় শাসকেরা যাতে তাদের ব্যবসায় বাধা দিতে না-পারে, সেটুকু তারা ঠেকাতে পেরেছিল।

ব্রিটিশ রাজশক্তি ও কোম্পানি এক ধরনের পারস্পরিক সুবিধাজনক সম্পর্কে অবস্থিত ছিল। ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে স্টুয়ার্ট রাজতন্ত্র পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই উপলক্ষ্যে কোম্পানি উৎসবের মেজাজে অনুষ্ঠান করে। রাজাকে যথোচিত সম্মান জানিয়ে কোম্পানি তাঁকে ৩০০০ পাউন্ড মূল্যের রুপোর ফলক উপহার দেয়। ১৬৬১ খ্রিস্টাব্দে রাজা একটি সনদে সই করেন এবং ক্রমওয়েলের সনদটিকে নাকচ করে দেন। রাজার এই কাজে কোম্পানির নির্দেশকেরা কৃতজ্ঞতা বোধ করেন। ১৬৬২ খ্রিস্টাব্দে সর্বসম্মতিক্রমে তাঁরা রাজার জন্য ১০,০০০ পাউন্ড ঋণ মঞ্জুর করেন। পরবর্তী বছরগুলিতে রাজার উদ্দেশে আরও ঋণ দেওয়া হয়েছিল। সব মিলিয়ে ১৫০,০০০ পাউন্ড। তার ফলে রাজাও সুযোগ-সুবিধা দিয়ে আরও সনদ কোম্পানির উদ্দেশে জারি করতেন। জন কী লিখছেন, "রাজা ও কোম্পানি একে অপরকে খুব ভালো বুঝতো..."।[৯১] ব্রিটিশ আমলের গোড়ার দিকে প্রশাসনের সুবিধার্থে তিনটি প্রেসিডেন্সি বিভাগ তৈরি করা হয়েছিল। এই প্রশাসনিক ইতিহাস থেকেও এদেশের উপনিবেশায়নে রাজার যে হাত ছিল তার ইঙ্গিত মেলে। বোম্বাইতে পর্তুগীজদের ঔপনিবেশিক বসতি ছিল। দ্বিতীয় চার্লস তাঁর বিয়ে উপলক্ষের এই বসতিপূর্ণ এলাকা পর্তুগীজ রাজার কাছ থেকে যৌতুক হিসেবে পেয়েছিলেন (১৬৬১ খ্রিঃ)। বছরে ১০ পাউন্ড খাজনার বিনিময়ে ১৬৬৮ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় চার্লস বোম্বাইকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে ছেড়ে দেন। ১৬৮৭ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিম উপকূলের রাজনৈতিক-প্রশাসনিক বিভাগের সদর দপ্তর সুরাট থেকে সরিয়ে আনা হয় বোম্বাইতে। এইখানে একটি দরকারি কথা বলে রাখা ভালো। হোয়াইটহলের একটি চুক্তির মাধ্যমে বোম্বাইকে চার্লসের হাতে তুলে দেওয়া হয়। সেই চুক্তিতে একটি গোপন বন্দোবস্ত ছিল। সেই গোপন অংশে ভারতে পর্তুগীজ বসতিগুলি রক্ষা করার কথা বলা ছিল। অর্থাৎ পর্তুগীজ রাজা ও চার্লসের মধ্যে এই চুক্তি ছিল একে অপরের রক্ষাকবচ, ভারতে ওলন্দাজ ইস্ট ইন্ডিয়া

কোম্পানির বাড়বাড়ন্তের বিরুদ্ধে। কোম্পানির হাতে বোম্বাইকে তুলে দেবার পরও পর্তুগীজদের রক্ষা করার দায়-দায়িত্ব রাজা নিজের হাতে রাখেন। এতে ইংরেজ কোম্পানির নির্দেশকেরাও রাজা চার্লসের প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করেন ও তাঁরা রাজার উদ্দেশে আরও একটি ঋণ মঞ্জুর করেন।[৯২] মাদ্রাজে প্রেসিডেন্সির বিকাশও অনেকটা ক্রমওয়েলের সনদের কারণেই ঘটেছিল এই অঞ্চলের উন্নয়ন তরান্বিত করার জন্য। কলকাতা প্রেসিডেন্সির বিকাশ পরের দিকে অর্থাৎ আঠারো শতকে হয়েছিল, এবং এর উন্নয়নে ও সুরক্ষায় লন্ডনের কর্তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।[৯৩] তবে এর আগে ১৬৮০'র দশকে আওরঙ্গজেব যুদ্ধবিগ্রহে ব্যস্ত থাকার সময়ে ইংরেজদের ব্যবসার স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তার বিরুদ্ধে রীতিমত হুমকি দেন। সেই অবস্থা স্যার জোশিয়া চাইল্ডের নেতৃত্বে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তার ব্যবসায়িক স্বার্থ সুরক্ষার উদ্দেশ্যে আক্রমণমূলক নীতি গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। তবে সামরিক দুর্বলতার কারণে ক্ষয়ক্ষতি হয় প্রচুর। কোম্পানির ভাগ্য ভাল ছিল যে আওরঙ্গজেব কোম্পানির বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেননি। কোম্পানি ক্ষমা চেয়ে নেয় এবং ক্ষতিপূরণ দেয়। বিনিময়ে সম্রাট কোম্পানির সুযোগ-সুবিধা ফিরিয়ে দেন। তবে কোম্পানি হেরে গেলেও কিন্তু তার আক্রমণাত্মক মনোভাব চাপা পড়ে না। কোম্পানির সেই মারমুখী ভাব "স্টুয়ার্ট রাজতন্ত্রের স্বেচ্ছাচারী কর্মপন্থার মতই ছিল। স্টুয়ার্ট রাজতন্ত্রও দুনিয়া জুড়ে বেপরোয়া স্বেচ্ছাচার চালাচ্ছিল।" আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে ভারতীয়দের তুলনায় ইয়োরোপীয়রা প্রযুক্তিগত জ্ঞান-বিজ্ঞানে নিশ্চিতভাবেই অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল। প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অগ্রসরতার কারণেই ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশে তাদের জয় নিশ্চিত করতে পেরেছিল। ফিলিপ লসনের ভাষায় বলা যায় যে কোম্পানির জয় ছিল "বেনামিতে ইংরেজ রাজশক্তির আগ্রাসী ও সাম্রাজ্যবাদী নীতিরই জয়।"[৯৪]

১৬৮৯ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় জেমসের পরে ইংল্যান্ডে ক্ষমতায় আসেন উইলিয়াম ও মেরি। ইংল্যান্ডে কোম্পানি আবার সমালোচনার মুখে পড়ে। সেখানে তখন হুইগদের রাজনৈতিক প্রাধান্য বেশি ছিল। ফলে কোম্পানির একচ্ছত্র অধিকার ও দুর্নীতিমূলক কাজকর্ম নিয়ে কোম্পানির বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে। প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আরেকটি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করা হয়। পুরানো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তখন তার সনদ নবীকরণের উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকারকে ৭০০,০০০ পাউন্ড উপহার দেবার কথা বলেছিল। সেই জায়গায় নতুন কোম্পানির উদ্যোক্তারা সরকারকে ২ মিলিয়ন পাউন্ড উপহার দেন। স্বভাবতই নতুন কোম্পানি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বিল আনা হয়। ১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দের কমন্স সভার অধিবেশনে বিলটি অনুমোদিত হয়ে যায়। এতে একটি ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, পূর্ব দিকে ব্যবসা করার অধিকার "বাজারে পণ্যের মতো কেনাবেচা করা যেত।" নতুন কোম্পানির এই অধিকার ব্রিটিশ সংসদ অনুমোদন করেছিল। কাজেই এতে ব্রিটিশ রাষ্ট্র লাভবান হয়েছিল,

রাজা ও রাজদরবারের লোকেদের তা থেকে কিছু লাভ হয় নি।[৯৫] ১৭০৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এই সমস্ত অসঙ্গতি মিটিয়ে ফেলা হয়। দুটি কোম্পানি আবার একজোট হয়। দুই কোম্পানি মিলে ব্রিটিশ রাষ্ট্রকে আর্থিক শক্তিতে ভরিয়ে তোলে। ইয়োরোপের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্রিটেনের কূটনৈতিক ভূমিকাকে উন্নত করে। এইভাবেই কোম্পানির আর্থিক ক্ষমতার সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বিস্তারের বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে মিশে গিয়েছিল। আঠারো শতকে আত্মবিশ্বাসে ভরপুর কোম্পানির নেতৃত্বে তাই ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তার শুরু হয়ে যায়।[৯৬] আঠারো শতকের গোড়াতে কোম্পানির আধিকারিকদের মধ্যে, লন্ডনের রাজনৈতিক মহলে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে ভারতে কোম্পানির নেতৃত্বে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বিস্তারের বিষয়টি আলোচিত হয়। কাজেই ভারতে কোম্পানির রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে কোন রকম নির্দেশ লন্ডন থেকে আসেনি—একথা মনে করা ঠিক হবে না। ১৭৭০'এর দশকে কোম্পানির সঙ্গে ব্রিটিশ রাজশক্তির সম্পর্ক আরও মধুর হয়ে ওঠে। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে কোম্পানি এদেশে রাজস্ব আদায় করত। বিভিন্ন এলাকাও তার দখলে ছিল। এই বাবদে ব্রিটিশ রাজকোষে কোম্পানি বছরে ৪০০,০০০ পাউন্ড নজরানা জমা দিতে রাজি হয়। ফলে কোম্পানির সঙ্গে ব্রিটিশ রাজশক্তির সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ট হয়ে ওঠে। সেই সূত্রে ভারতবর্ষে কোম্পানি তার অবস্থানকে সরকারি ভাবে পাশও করে নেয়। ততদিনে ব্রিটিশ সরকারও "দূরবর্তী দেশ ভারতবর্ষ থেকে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ রাজস্ব পাওয়ার ব্যাপারে কোম্পানিকে শক্তিশালী উপায়স্বরূপ" মনে করতে থাকে। "ব্রিটিশ জাতির উন্নয়নের স্বার্থে" কোম্পানির মতো যৌথ কারবারি প্রতিষ্ঠানে জনগণের মূলধন লগ্নি করা হয়েছিল। বোঝা যায় যে, লভ্যাংশসহ লগ্নিকৃত সেই অর্থ ফেরত পাওয়ার জন্য এদেশের ব্যবসা বাণিজ্যে ও অধিকৃত এলাকায় কোম্পানিকে বিভিন্ন সনদের মাধ্যমে "সার্বভৌম ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল"। তবে সার্বভৌমত্বের ব্যাপারে রেগুলেটিং অ্যাক্টে সমস্ত অস্পষ্টতার নিরসন করা হয়। সাগরপারের সব অধিকৃত এলাকাগুলির ওপর ব্রিটিশ রাষ্ট্রশক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।[৯৭] পরবর্তীকালে লন্ডনের কর্তারা যদি সাম্রাজ্য বিস্তারে আদৌ বিমুখ হয়ে থাকেন, তবে তা শুধুমাত্র যুদ্ধবিগ্রহ বাবদ খরচপাতির কারণেই হয়ে থাকবেন। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সম্পদের ভাগ তারা যথেষ্টই পেতে চাইতেন। কিন্তু সেই সম্পদ জোগাড় করার খরচ তারা বহন করতে চাইতেন না। কিংবা সেই সমস্ত তদারকি করার বোঝা বহনেও তারা রাজি ছিলেন না।[৯৮]

পি.জে. কেইন ও এ.জি. হপকিন্স্ মনে করেন আঠারো শতকের দ্বিতীয় অর্ধে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তারের মধ্য দিয়ে "ভদ্রলোক পুঁজিবাদের" প্রসার শুরু হয়েছিল। ১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দের পরে লন্ডনে জমিদার শ্রেণী ও পুঁজিপতি শ্রেণীর মধ্যে মেলবন্ধন ঘটে। এই দুই শ্রেণীর প্রাধান্য বাড়ে। এরই পরিণামে পুঁজিবাদের প্রসার শুরু হয়। সেই কারণেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যিক নীতির "প্রধান বিবেচ্য বিষয়ই

ছিল রাজস্ব।" [৯৯] কেইন ও হপকিন্স্ সাম্রাজ্যবাদের আলোচনায় প্রধান শহুরে কর্মকেন্দ্রের প্রসঙ্গ ফিরিয়ে আনেন। ইংল্যান্ডের ক্রমবর্ধমান অভ্যন্তরীণ ও সাগর বাণিজ্যের স্বার্থে প্রয়োজনীয় অর্থের জোগান দেওয়া দরকার হয়ে পড়েছিল। সেই বিবেচনায় ভারতবর্ষের রাজস্ব সম্পদ সংগ্রহ করা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। একথা অস্বীকার করা কঠিন। সেই রাজস্ব সম্পদ সংগ্রহের তাড়ানাতেই এদেশে বিভিন্ন এলাকা দখল শুরু হয়ে যায়। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। তবে এলাকা দখলের পিছনে শুধুমাত্র রাজস্ব সংগ্রহ ও ব্যবসার তাড়নাই ছিল না। আঠারো শতকে ভারতবর্ষে আরও কিছু স্বার্থ কাজ করছিল। কোম্পানির রাজ্য বিস্তারের পেছনে সে সব স্বার্থ পূরণের মতলবও ছিল। একেবারে শুরু থেকেই কোম্পানির একচ্ছত্র অধিকার নানাভাবে বিপন্ন হয়। আঠারো শতকে তা সংকটের পর্যায়ে ওঠে। সতেরো শতকে "অননুমোদিত ব্যবসাদারেরা" ব্যবসায় কোম্পানির একচ্ছত্র অধিকারকে সরাসরি অস্বীকার করতে থাকে, ইংল্যান্ড ও ভারত মহাসাগরীয় দেশগুলির মধ্যে বেআইনি ব্যবসা চালিয়ে এবং সেই বেআইনি ব্যবসায়ে অর্থের জোগান দিয়ে। এইসব বেআইনি ব্যবসাদারদের ক্ষমতা খর্ব করার উদ্যোগ নেওয়া হত। তবে তা করতে গিয়ে অনেক সময় সাংবিধানিক সংকটও দেখা দিত, যেমন ১৬৬৮—৬৯ খ্রিস্টাব্দে স্কিনার বনাম ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মামলা। সেই সংকটে লর্ড সভা কার্যত একজন বেআইনি ব্যবসাদারের অধিকারকেই সমর্থন করেছিল। [১০০] তবে এই বেআইনি ব্যবসার সমস্যা কোম্পানির নিজের সাংগঠনিক কারণেই কার্যত বেড়ে যায়। কোম্পানির কর্মচারীরা সামান্য বেতন পেত। তাদের সেই আর্থিক ঘাটতি পূরণ করার উদ্দেশ্যে তারা এদেশের ব্যবসাতে ঢুকে পড়ে। আবার কিছু ব্যবসায়ী ছিল যারা কোম্পানির কর্মচারী ছিল না ; কিন্তু তাদেরকে কোম্পানির প্রতিষ্ঠানে গুছিয়ে বসার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। এইসব ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীরা ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গেই একযোগে ব্যবসা করত। কোম্পানি এইসব ব্যক্তিগত ব্যবসাদারদের উপেক্ষা তো করতই, বরং এদেরকে উৎসাহ দিত, যতদিন পর্যন্ত তারা ইয়োরোপ ও ভারতের মধ্যে সাগরবাণিজ্যে সরাসরি অংশ না নিয়েছে।

এই দুই ধরনের ব্যবসা একসঙ্গে চলতে থাকায় আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সমস্যা তৈরি হয়। যখনই এইসব ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের স্বার্থের সঙ্গে কোম্পানির স্বার্থের সংঘাত লাগত, তখনই শুরু হয়ে যেত ঠকবাজি, ফন্দিফিকির, ব্যাপক বেআইনিভাবে ধারে কেনা-বেচা ইত্যাদি। কোম্পানির লভ্যাংশকে একেবারে নিঃশেষিত করে দেওয়া হত। [১০১] আপাতত প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তিগত ব্যবসায়ী এবং অননুমোদিত ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রায়ই তলায় তলায় বোঝাপড়া হত। ব্যবসায় এমন কূটযোগে যতটা লাভ হত, সেটুকু হুণ্ডি করে কোম্পানির লন্ডনের কার্যালয়ে অথবা ওলন্দাজ কোম্পানির আমস্টারডামের কার্যালয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। এইভাবে ১৭৫০-এর দশকে বছরে গড়ে ১০০,০০০ পাউন্ড শুধমাত্র ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মাধ্যমেই

পাঠানো হয়েছিল। এই অর্থ কোম্পানির কর্মচারীদের বার্ষিক বেতনের ষাটগুণ বেশি ছিল। আরও গুরুতর ব্যাপার এই যে, মুঘল কর্তারা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে যেসব ব্যবসায়িক সুযোগ-সুবিধা দিয়েছিলেন, এইসব ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীরা সেসব সুযোগের অপব্যবহার করতে থাকে। মুঘল কর্তৃপক্ষ যাতে কর ধার্য না করে সেই উদ্দেশ্যে কোম্পানির স্থানীয় দপ্তরগুলি কোম্পানির পণ্যের করমুক্তির কথা ঘোষণা করে অনুমতিপত্র ছাড়ত। একে বলা হতো দস্তক। কিন্তু কোম্পানির কর্মচারীরা তাদের ভারতীয় দালালদের উদ্দেশ্যে সেই দস্তক প্রায়ই ছাড়ত। এইভাবে মুঘল সরকারকে প্রচুর পরিমাণে রাজস্ব ফাঁকি দেওয়া হত। নির্দেশক সভা এই দুর্নীতি বন্ধের চেষ্টা করে। কিন্তু ফল কিছুই হয়নি। বরং এই দুর্নীতিকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের মুঘল শাসক ও কোম্পানির মধ্যে ১৭৫০-এর দশকে সংঘর্ষ ঘনিয়ে ওঠে। এইভাবেই ভারতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসেবে কোম্পানির আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্র তৈরী হয়।[১০২] নানা কারণের সমাবেশে কোম্পানির এলাকা দখল চলে। প্রায় একশ বছর ধরে এদেশে কোম্পানির সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। কোম্পানির এই সাম্রাজ্য গড়ে তোলার ব্যাপারটি ভাল করে লক্ষ্য করলে একটি জিনিস পরিষ্কার হয়। প্রান্তীয় এলাকার চাপ এবং শহুরে কেন্দ্রীয় কর্মকেন্দ্রের উৎসাহ সবসময়ে পরস্পরের ওপর কাজ করেছে। রাজস্বের সন্ধান, ব্যবসায়িক সুযোগ-সুবিধার খোঁজ, জরুরী প্রয়োজনে সামরিক প্রয়াস সবই এলাকা দখলের প্রক্রিয়াকে তরান্বিত করেছিল। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য গড়ে ওঠার পেছনে উক্ত সবই চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করেছিল।

বাংলা থেকেই এই প্রক্রিয়ার শুরু। কারণ এশিয়া থেকে ইংরেজরা যে পরিমাণ পণ্য আমদানি করত, তার প্রায় ৬০ শতাংশই ছিল বাংলার পণ্য। কাজেই বোম্বাই সুরাট ও মালাবার তথা পশ্চিম উপকূলের বাণিজ্যের চাইতে কোম্পানির বাংলাদেশে বাণিজ্যিক স্বার্থ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।[১০৩] বাংলা থেকে আমদানি বাণিজ্যের দিকেই কোম্পানি ক্রমশ ঝোঁকে। ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দে আওরঙ্গজেব এক আদেশনামায় কোম্পানিকে বাংলাদেশে বিনাশুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার দেন। বিনিময়ে কোম্পানি সম্রাটকে বার্ষিক ৩০০০ টাকা নজরানা দিত। ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার গোড়াপত্তন হয়। ১৬৯৬ খ্রিস্টাব্দে তার সুরক্ষার ব্যবস্থা হয়। এর দুবছর পরে অর্থাৎ ১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি লাভ করে কলিকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুরের জমিদারি। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর পরিস্থিতি অশান্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট ফারুকশিয়ারের ফরমানের ফলে পরিস্থিতি কিছুটা ঠাণ্ডা হয়। কোম্পানি বিনাশুল্কে ব্যবসা করার অধিকার আবার ফিরে পায়। কলকাতার আশেপাশে আটত্রিশটি গ্রামের রাজস্বের অধিকারীও হয় কোম্পানি। সেই সঙ্গে রাজকীয় টাঁকশাল ব্যবহার করার অধিকারও কোম্পানি লাভ করে। এসবই ফারুকশিয়ারের ফরমানে আনুষ্ঠানিক করা হয়েছিল। কিন্তু আবার এই আদেশনামার কারণেই বাংলার নতুন স্বাধীন শাসক মুর্শিদকুলি খানের সঙ্গে

কোম্পানির বিবাদ শুরু হয়, যেহেতু মুর্শিদকুলি কোম্পানির কর্মচারীদের বিনাশুল্কে ব্যবসা করার অনুমতি দেন নি। কোম্পানির কর্মচারীরা অবাধে দস্তকের অপব্যবহার করতে থাকে। নবাব প্রচুর রাজস্ব হারান। স্বভাবতই তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। নবাব কোম্পানিকে ঐ আটত্রিশটি গ্রাম কিনে নেওয়ার অনুমতিও দিতে অস্বীকার করেন। টাঁকশাল ব্যবহারের সুবিধাও দিতেও তিনি নারাজ ছিলেন। এইভাবে ১৭১৭খ্রিস্টাব্দ থেকেই নবাব ও ইংরেজের মধ্যে সমস্যা শুরু হয়ে যায়।

১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে ইয়োরোপে অস্ট্রিয়ায় উত্তরাধিকার নিয়ে যুদ্ধ বাধে। সেই সূত্রে ভারতে ফরাসি ও ইংরেজ কোম্পানির মধ্যেও তিক্ততার সৃষ্টি হয়। বাংলায় নবাব আলিবর্দি খান দুই কোম্পানিকে সামলে রেখেছিলেন যাতে তারা প্রকাশ্যে কোন গণ্ডগোলে জড়িয়ে না-পড়ে। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে ফরাসিদের জয়ে বাংলায় ইংরেজরা শঙ্কিত হয়ে পড়ে। বাংলায় ফরাসি হানার বিরুদ্ধে নবাব ইংরেজদের রক্ষা করতে পারবেন এমন বিশ্বাস বা ভরসা তাদের ছিল না। আরও একটা ব্যাপার ছিল যেটি সম্প্রতি জানা গেছে।[১০৪] ১৭৫০-এর দশকে ইংরেজদের ব্যক্তিগত ব্যবসায় খুবই মন্দা যায়। কারণ এশিয় বণিকদের সঙ্গে গোপনে বোঝাপড়া করে নিয়ে ফরাসিরা ইংরেজদের সঙ্গে বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করে দেয়। এই অবস্থায় নবাবের অনুমতি না নিয়েই কলকাতার রক্ষা ব্যবস্থা ইংরেজরা আরও মজবুত করে তোলে (১৭৫৫ খ্রিঃ)। এমন কী নবাবের দরবার থেকে যারা পালিয়ে আসত, তাদেরকেও ইংরেজরা আশ্রয় দিত। এব্যাপারে ইংরেজরা নবাবের কর্তৃত্বকে পরিষ্কার অস্বীকার করে। সিরাজ-উদ্-দৌলার আমলে (১৭৫৬ খ্রিঃ) ইংরেজদের সঙ্গে তাঁরা সংঘর্ষ চরমে পৌঁছায়। দস্তকের অপব্যবহার করে ইংরেজরা তাদের লোভনীয় ব্যক্তিগত ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিল। সিরাজ সেই বেআইনি ব্যবসা করতে সচেষ্ট হন। উপরন্তু ইংরেজরা কৃষ্ণ বল্লভকে আশ্রয় দেয়। এই কৃষ্ণ বল্লভের বিরুদ্ধে নবাব প্রতারণার অভিযোগ এনেছিলেন। সেই সঙ্গে কলকাতার রক্ষা ব্যবস্থা ইংরেজরা আরও শক্তপোক্ত করে তোলে। ইংরেজদের এইসব কাজকর্ম নবাবের কর্তৃত্বের সরাসরি বিরোধী ছিল। নবাবের একাধিপত্যের পক্ষেও তা সঙ্কটজনক ছিল। কোম্পানি সিরাজের সতর্কবাণী অগ্রাহ্য করলে তিনি কোম্পানির কাশিমবাজারের কুঠি অধিকার করে নিয়ে নবাবের শক্তি দেখিয়ে দেন। কোম্পানির শাসনকর্তা ড্রেক মনে করতেন যে, ইংরেজদের কাশিমবাজারের ঐ পরাজয়ের শোধ তিনি বলপ্রয়োগ করে তুলে নিতে পারতেন। তাই ব্যাপারটি কূটনৈতিক স্তরে আলোচনা করে মীমাংসা করার যে প্রস্তাব নবাব দিয়েছিলেন, ড্রেক তাকে উপেক্ষা করেন। এরপর সিরাজ কলকাতা আক্রমণ করেন এবং অধিকার করে নেন (২০শে জুন)।

এর ফলেই সঙ্কট বাধে। ফরাসিদের সঙ্গে সিরাজের বন্ধুত্ব নিয়ে ইংরেজদের আশঙ্কা ছিল। তাদের ব্যবসায়িক সুযোগ সুবিধা কমে যাবে বলে তারা উদ্বিগ্নও ছিল। এই অবস্থায় মাদ্রাজ থেকে রবার্ট ক্লাইভ দলবল নিয়ে বাংলায় হাজির হন।

হুগলি ধ্বংস হয়। চন্দননগরে ফরাসিরা ধরাশায়ী হয়। এদিকে সিরাজ তখন আবদালির নেতৃত্বে আফগান আক্রমণের আশঙ্কা করছিলেন, তাই ইংরেজদের সঙ্গে আপস-মীমাংসার চেষ্টা করেন। কিন্তু ক্লাইভ একেবারে আচমকা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বাংলায় ক্ষমতা দখলের সঙ্কল্প করেন। কলকাতায় কোম্পানির কর্মচারীরাও নির্ভীক ছিল। তারা স্বেচ্ছাচারী তরুণ নবাব সিরাজের শাসন মেনে নিতে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। কারণ নবাব তাদের ব্যবসায়িক সুযোগ সুবিধাগুলি বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দিচ্ছিলেন এবং অভাবনীয় রকমের ধনসম্পদ বৃদ্ধির যে-সুযোগ তাদের ছিল, সেটাও নবাব ধ্বংস করেছিলেন।[১০৫] আবার নবাবের দরবারেও ছিলেন একদল অসন্তুষ্ট লোক। সেই দলে ছিলেন ব্যবসায়ী, মহাজন, পুঁজিপতি, এবং শক্তিশালী জমিদারেরা, যেমন জগৎ শেঠ ভাইয়েরা, অর্থাৎ মহতব রাই ও স্বরূপচাঁদ, রাজা জানকী রাম, রায় দুর্লভ, রাজা রামনারায়ণ এবং রাজা মানিক চাঁদ। এরা শঙ্কিত হয়ে ওঠেন কারণ, তরুণ স্বাধীন নবাব উদ্দ্যম গতিতে দরবারে নতুন করে ক্ষমতার বিন্যাস ঘটাতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এছাড়াও ভারতীয় ব্যবসায়িক সম্প্রদায় ও ইয়োরোপীয় ব্যবসাদারদের মধ্যে বাণিজ্যিক স্বার্থে স্বাভাবিক মিল ছিল। অনেক ভারতীয় ব্যবসায়ী ইংরেজ কোম্পানি ও ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের সঙ্গে একযোগে ব্যবসা করত। সেক্ষেত্রে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা দাদনী ব্যবসা করত। অর্থাৎ গ্রাম গ্রামান্তরে বস্ত্র বয়নকারীদের দাদন দিয়ে তাদের কাছ থেকে বস্ত্র সংগ্রহ করে আনত এবং ইংরেজ ব্যবসায়ীদের সেই বস্ত্র সরবরাহ করত। ভারতীয় বণিকদের অনেকেই ইংরেজদের জাহাজে মাল পাঠাত। বস্তুত এতেই কলকাতা বন্দরের গুরুত্ব বাড়ে এবং হুগলী বন্দরের ধীরে ধীরে অবনতি ঘটে।[১০৬] কাজেই নবাবের সঙ্গে এদের গোলমাল একেবারে অসম্ভব ছিল না। গোলমালের জেরে শুরু হয় সিরাজকে সরিয়ে তাঁর সেনাপতি মীরজাফরকে বাংলার মসনদে বসানোর ষড়যন্ত্র। কারণ মীরজাফর ছিলেন জগৎ শেঠদের পছন্দের লোক এবং তাঁদের সাহায্যে ছাড়া আচমকা ক্ষমতা দখল করা কার্যত অসম্ভব ছিল। মুর্শিদাবাদের নবাবের দরবারে আগে থেকেই কোন ষড়যন্ত্র হচ্ছিল কিনা কিংবা ইংরেজরা সেই ষড়যন্ত্রের সুবিধা নিয়েছিল কিনা, কিংবা ইংরেজরা কোন ষড়যন্ত্র পাকিয়েছিল কিনা—এসব প্রশ্ন নিয়ে ঐতিহাসিকেরা নিরর্থক তর্কবিতর্ক অনেক করেছেন। নিরর্থক এই কারণে যে, এসব প্রশ্নের খুব একটা গুরুত্ব নেই। যেটি গুরুত্বপূর্ণ তা হল একটি অশুভ আঁতাত গড়ে উঠেছিল যার পরিণাম ছিল পলাশির যুদ্ধ (জুন ১৭৫৭ খ্রিঃ)। সেই যুদ্ধে ক্লাইভ সিরাজকে চূড়ান্তভাবে পরজিত করেন। পলাশির যুদ্ধকে হাতাহাতির বেশি কিছু বলা যায় না যেহেতু মীরজাফরের নেতৃত্বে নবাবের বিশাল সেনাদল যুদ্ধের সময় হাত গুটিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু এর রাজনৈতিক তাৎপর্য ছিল অসীম। পলাতক সিরাজ খুব তাড়াতাড়িই ধরা পড়ে যান। তাঁকে মেরে ফেলা হয়। ইংরেজদের হাতের পুতুল হয়ে মীরজাফর নতুন নবাব হিসেবে বাংলার মসনদে বসেন। পলাশির যুদ্ধ জয়ের মধ্য দিয়ে ভারতে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজনৈতিক আধিপত্য শুরু হয়ে যায়।

এরপর যা শুরু হল তাকে "পলাশির লুটপাট" বলে অভিহিত করা চলে। যুদ্ধের পরে পরেই ইংরেজ সেনাবাহিনী বিশাল পরিমাণ টাকা পায় — ২,৭৫০০০ পাউন্ড।[১০৭] ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে থেকে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কোম্পানি মীরজাফরের কাছ থেকে পায় ২২,৫০০,০০০ টাকা। ক্লাইভ নিজের জন্য ৩৪,৫৬৭ পাউন্ড মূল্যের জাগির পেয়েছিলেন (১৭৫৯ খ্রিঃ)। কোম্পানি তার ব্যবসায় বড়সড় পরিবর্তন আনে। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের আগে কোম্পানি ইংল্যান্ড থেকে সোনা-রূপা আমদানি করে বাংলাদেশের ব্যবসায়ে টাকার জোগান দিত। কিন্তু ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের পরে ইংল্যান্ড থেকে সোনা-রূপা আমদানি করা বন্ধ হয়ে যায়। বরং বাংলাদেশ থেকে সোনা-রূপা চীন ও ভারতের অন্যান্য জায়গায় রপ্তানি করা শুরু হয়। এর ফলে ইংরেজ কোম্পানি তার ইয়োরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতায় বেশ সুবিধাজনক জায়গায় দাঁড়াবার সুযোগ পায়।[১০৮] অন্যদিকে পলাশির যুদ্ধ জয়ের ফলে কোম্পানীর কর্মচারীদের কপাল খুলে যায়। শুধুমাত্র জুলুমবাজি করেই নয়, দস্তকের যথেচ্ছ অপব্যবহার করে কোম্পানির কর্মচারীরা ব্যক্তিগত ব্যবসা চালাত এবং অভাবনীয় রকমের ধনসম্পদ সংগ্রহ করেছিল। কিছুদিন এইভাবে চলার পর মীরজাফর বুঝতে পারেন ইংরেজদের আর্থিক দাবি মেটানো কঠিন। কোম্পানি তাঁকে মসনদ থেকে সরিয়ে দেয়। তাঁর জামাই মীরকাশিমকে মসনদে বসানো হয় (১৭৬০খ্রি. অক্টোবর)। কিন্তু আবার গোলমাল বাধে। এবারেও সেই পুরানো সমস্যা। কোম্পানির কর্মচারীরা ব্যবসায়িক সুবিধার অপব্যবহার করেছিলেন। দস্তকের অপব্যবহার রুখতে না পেরে নতুন নবাব অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য শুল্কই তুলে দেন। ফলে ভারতীয় ব্যবসায়ীরাও ইংরেজ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সমান তালে শুল্কহীন বাণিজ্যের সুবিধা ভোগ করে। কিন্তু ইংরেজ বণিকেরা ভারতীয় বণিকদের এতটা স্বাধীনতা পছন্দ করেনি। এর সমুচিত জবাব ইংরেজ বণিকেরা দিয়েছিল মীরকাশিমকে সরিয়ে দিয়ে মীরজাফরকে আবার মসনদে বসিয়ে।

১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে মাসে মীরকাশিম বংলা থেকে পালিয়ে যান। মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম ও অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ্-দৌলাকে নিয়ে মীরকাশিম এক মহাজোট গড়ার চেষ্টা করেন। দিল্লির নোংরা রাজনীতি থেকে বেরিয়ে গিয়ে দ্বিতীয় শাহ আলম পূর্ব দিকে একটি নিজস্ব স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের চেষ্টায় ছিলেন। ১৭৫৯ খ্রিস্টাব্দে শাহ আলমের পিতা নিহত হন। শাহ আলম নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেন এবং সুজাকে উজির নিয়োগ করেন। মীরকাশিম পালিয়ে গিয়ে শাহ আলমের কাছে আশ্রয় চান। শাহ আলমের সঙ্গে মীরকাশিমের দীর্ঘ আলোচনা ও বোঝাপড়ার পর ঠিক হয় যে তাঁরা দুজনে মিলে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়বেন। সঙ্গে সুজাকেও নেওয়া হয়। স্থির হয় ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই সফল হওয়ার পর সুজাকে বিহার এলাকা ও সেখানকার সমস্ত রাজস্ব তথা রাজকোষ দেওয়া হবে। সেইসঙ্গে

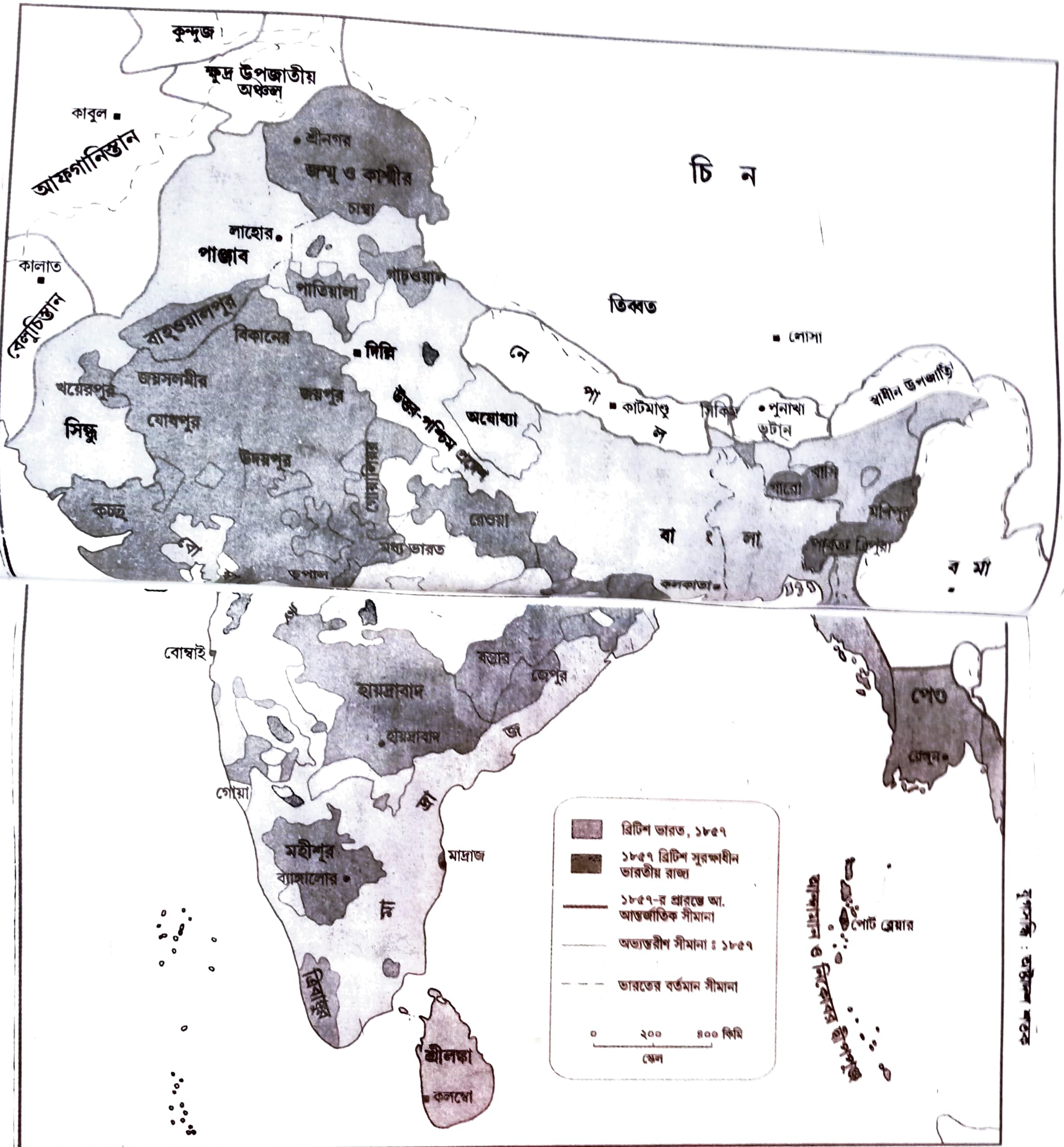

মানচিত্র ৩ :১৮৫৭ সালে ভারতে ব্রিটিশ অধিকৃত অঞ্চলসমূহ

নগদ ৩০,০০০,০০০ টাকাও দেওয়া হবে। এইসব কথা দেওয়ার পরই দলে সুজার সমর্থন ও সাহায্য পাকা হয়। কিন্তু এই তিন সম্মিলিত বাহিনী বক্সারের যুদ্ধে (১৭৬৪ খ্রি.) শোচনীয় ভাবে হেরে যায়। কারণ, আঠারো শতকে মীরকাশিমদের ত্রৈ মিলিত বাহিনীতে সেনারা ছিল নানাবিধ সামাজিক মানসিকতায় বিভক্ত আর ইংরেজদের বাহিনীতে সেনারা ছিল কৌশলী ও দক্ষ এবং চলত এক কেন্দ্রীয় নির্দেশে। ফলে মীরকাশিমদের বাহিনী ইংরেজদের বাহিনীর বিরুদ্ধে বেজায় অসুবিধায় পড়ে। ইংরেজদের বক্সারের যুদ্ধ জয় অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। কোম্পানি বিজয়ী হলেও বিজিত মুঘল সম্রাটকে যথোচিত সম্মান দেখায়। কারণ আঠারো শতকের ভারতীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মুঘল সম্রাটের মান্যতা ছিল, প্রতীকী গুরুত্বও ছিল। বস্তুত ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের আগে কোম্পানি মুঘল সম্রাটের কর্তৃত্ব বা একাধিপত্যকে আনুষ্ঠানিকভাবে অস্বীকার করেনি। বিনিময়ে ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে এলাহাবাদে এক চুক্তি সই হয়। সেই চুক্তি অনুযায়ী শাহ আলম কোম্পানিকে দিওয়ানি মঞ্জুর করে। অর্থাৎ বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা থেকে রাজস্ব আদায় করার অধিকার মুঘল সম্রাট কোম্পানিকে দিয়ে দেন। অন্যভাবে বলা চলে সমৃদ্ধিশালী সুবা-বাংলায় বিপুল পরিমাণ লোভনীয় সম্পদের ওপর কোম্পানি এখন থেকে নিয়ন্ত্রিণী ক্ষমতা পেল। মুর্শিদাবাদের নবাবের দরবারে ব্রিটিশের প্রতিনিধি বা রেসিডেন্ট বসিয়ে দেওয়া হয়। ধীরে ধীরে ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তিনি প্রকৃত প্রশাসনিক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে বসেন। এইভাবে কোম্পানির পরোক্ষ শাসনের সাম্রাজ্যবাদী নীতি বাংলাতেই প্রথম হয়।[১০৯] কোম্পানির কলকাতা দপ্তরে সম্পদের অভাব ছিল। সেই অভাবের চাপ অযোধ্যাকে সামলাতে হয়। চুক্তি অনুযায়ী সুজা-উদ্-দৌলাকে ৫০০০,০০০টাকা দিতে হল। এখন থেকে নবাব ও কোম্পানি একে অপরের এলাকা রক্ষা করে চলবে বলে ঠিক হল। ব্রিটিশ প্রতিনিধিকে নবাবের দরবারে বসানো হল। অযোধ্যায় কোম্পানি বিনা শুল্কে ব্যবসা করার অধিকার পেল। চুক্তির এই অংশ পরবর্তীকালে নতুন করে উত্তেজনার সৃষ্টি করে। এবং শেষ পর্যন্ত অযোধ্যায় ব্রিটিশের সাম্রাজ্যভুক্ত হওয়ার কারণও এইখানে নিহিত ছিল।[১১০]

১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পূর্ব ভারত কোম্পানির অধীনে চলে যায়। এবারে কোম্পানির দক্ষিণ দিকে সাম্রাজ্য প্রসারণের পালা। দক্ষিণ দিকে প্রভাবের সীমানা বাড়াতে গিয়ে ফরাসিদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়ে যায়। ইয়োরোপ থেকে ফরাসিরাই সবার শেষে ভারতে এসেছিল। তবে ফরাসিরাই কিন্তু উপমহাদেশের প্রথম সাম্রাজ্য স্থাপনের উচ্চাভিলাষী চিন্তা করে। ১৬৭৪ খ্রিস্টাব্দে দুপ্লে ফরাসিদের প্রধান কর্মকেন্দ্র পন্ডিচেরীকে রাজনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলেন। দুপ্লে বাংলায় প্রথম আসেন ১৭৩১ খ্রিস্টাব্দে। তখন তিনি চন্দননগরে ফরাসিদের শাসনকর্তা। দশ বছরের মধ্যে চন্দননগরে ফরাসিদের ব্যবসা বেশ ফুলেফেঁপে ওঠে। দুপ্লে ভারতবর্ষকে অপছন্দ করতেন। তিনি কাজপাগল লোক ছিলেন। তাই লাভজনক